BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/02100026

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 10| November 2024| e-ISSN: 2584-1890

প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা ও আধুনিকরণের প্রচেষ্টা

Akash Ghosh

B.Sc (Mathematics), Email- akashghoshobserver@gmail.com

সারাংশ:

ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। এই সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক সংকট, শিক্ষার মান, উপস্থিতির হার, অভিভাবকের সচেতনতার অভাব, ড্রপআউট, প্রযুক্তির অভাব, শিক্ষা ব্যবস্থার জটিলতা, সামাজিক সমস্যা, এবং অর্থের অভাব।

এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য সরকার, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। সরকারকে শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। অভিভাবকদের শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে হবে, এবং তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর জন্য প্রেরণা দিতে হবে।

আধুনিকরণের ক্ষেত্রে, প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের সুবিধা প্রদান করা উচিত, যাতে তারা আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। শিক্ষার পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হয় এবং তাদের দক্ষতা বিকাশ করতে পারে। এছাড়াও, শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা প্রয়োজন, যাতে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষার বিষয়ে সঠিক তথ্য পেতে পারে। শিক্ষার অধিকার সকল শিক্ষার্থীর জন্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন, বিশেষ করে দরিদ্র এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য।

মূল শব্দ: *প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষক সংকট, শিক্ষার মান, উপস্থিতির হার, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের সুবিধা, শিক্ষার্থীর দক্ষতা।*

ভূমিকা:

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষার মাধ্যমে একটি জাতি উন্নত শিখরে পৌছতে পারে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষৎ।প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর সামাজিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি শিক্ষা করে তাকে আগামী দিনের কাণ্ডারি হওয়ার পথ তৈরি করে দেয়। তাই এ শিক্ষাকে মানুষ গড়ার আঁতুড়ঘর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিশুকে ভবিষ্যতের দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা হলো প্রথম ও প্রধান সোপান। প্রতিটি শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ, আনন্দময় বর্তমান, সৃজনশীল ভবিষ্যৎ ও প্রগতিশীল উৎপাদনমুখর উন্নত সমাজ বিনির্মাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ কাজই সম্পাদন করে প্রাথমিক শিক্ষা। গবেষকদের বিভিন্ন গবেষণায় এ ধারণা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগ মূল উন্নয়নের ভিত্তিকে শক্তিশালীকরণ। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর বিভিন্ন গবেষণা ও তাঁর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে বার বার উল্লেখ করেছেন যে, চীনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় চীন সরকারের সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানকে উন্নয়নের মূল ভিত্তি ও অগ্রযাত্রায় ত্বরান্বিত করেছে। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টির ক্ষেত্রে তিনি সবসময় চীনের উদাহরণ টেনেছেন। তিনি বলেন ভারত থেকে চীন এগিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বাধিক বিনিয়োগকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশিকা নীতিমালার ৪৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র সংবিধান প্রবর্তনের দশ বছরের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবে।" যদিও এই নির্দেশিকা পূরণের জন্য সময়ে সময়ে তালিকাভুক্তির উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তবুও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এখনও আমাদের নাগালের বাইরে। স্বাধীনতার পরে অপ্রত্যাশিত অগ্রগতি সত্ত্বেও লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তাই সাংবিধানিক নির্দেশিকা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি তার কারণ হিসেবে অসংখ্য সমস্যা রয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষার কিছু উল্লেখযোগ্য সমস্যা হল :

1. শ্রেণি কক্ষ স্বল্পতা:

বর্তমানে শিশুর সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, শিক্ষক অনুপাত শিক্ষার্থী অনুপাত শ্রেণিকক্ষের ধারণ ক্ষমতার অনুপাত একবারে শোচণীয়। এতে শিক্ষক যেমন অধিক শিক্ষার্থীর কারণে হিমশিম খাচ্ছে তেমনি শিক্ষর্থীর তার পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে...

2. দরিদ্র জনগোষ্ঠি:

আমাদের বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকায় বসবাসরত অভিভাবক গণ নিতান্ত গরীব। যারা তার বাচ্চার খাবার, পোষাক ও শিকাষা উপকরণ দিতে অক্ষম। এছাড়া বাবা মায়ের সাথে পারিবারিক উপার্জনের কাজে তাদের সময় দিতে হয়। ফলে আমাদের শিশুরা কায়িক শ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দিনের শেষে তাদের পড়াশুনা করার মতো অবস্থা থাকে না।

3. অভিভাবকের অসচেতনতা:

অভিভাবক গণ অত্যন্ত অসচেতন। একজন শিশুর প্রতি তাদের কি দায়িত্ব থাকতে পারে তা তারা অবগত নন সাথে অবহেলা ও করে থাকেন। তারা বুঝে না শিশুর পেছনে আজকের বিনিয়োগ তার পরিবার সহ দেশের কতটা পরিবর্তন আনতে পারে। অভিভাবকগণ নগদ ও দ্রুত ফলাফল আশা করেন। তারা আশা করেন তার বাচ্চা অল্পতেই তার পরিবারের হাল ধরবে। অভিভাবকের দেয়া ভাতে বিনিময়ে তার সংসার (বাবার সংসার) এর হাল ধরবে। তাই বাচ্চাকে কোন চায়ের দোকানে দিয়ে ৫০০/- ৭০০/- টাকাকে বড় মনে করেন।

4. সামাজের মাতাব্বর শ্রেণির প্রভাব:

অতিত থেকে বর্তমান পর্যন্ত দেখা যায় কিছু মাতাব্বর শ্রেণির লোক তার এলাকা নিজের মধ্যে বা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে জিম্মি করে রাখে। সাথে সাথে কোন শিশু একটু গুনতে, পড়তে জানলে কৌশলে তাকে তার বাড়ির কাজে বেতন দিয়ে কামলা করে রাখে। যেন সে আর পড়তে না পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টাকা খরচ করে নকল যুক্ত পরিবেশ বলবৎ রাখে।

5. এস.এম.সি কমিটির উদাসীনতা:

বর্তমান সরকার বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। তার পরও কিছু এস.এম.সি কমিটি সরকার কর্তক দেয় টাকা কৌশলে নিজের পকেট ভরে রাখে। পক্ষান্তরে বিদ্যালয় ও তার পরিবেশ কি অবস্থায় আছে তার কোন খবর রাখে না।

6. কিছু প্রধান শিক্ষকের উদাসীনতা:

কিছু বহিরাগত প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষক তাদের নিজের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা করানোর জন্য জেলা শহরে বদলী হয়ে চলে আসে। তারা জেলা শহরে আসার পর তার বিদ্যালয়ের প্রতি উদাসীন থাকে। তখন ঐ বিদ্যালয় ও ক্যাচমেন্ট এলাকা ক্ষতি গ্রস্থ হয়।

7. যাতায়ত সমস্যা:

দূর্গম এলাকায় বিদ্যালয় হলে পায়ে হেঁটে শিশুদের পক্ষে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়াযেমন সম্ভব নয় তেমনি শিক্ষকগণও নিয়মিত যাওয়া সম্ভব নয়। যাতায়তের এই দুরাবস্থার কারণে শিক্ষা উন্নয়ন ব্যহত হয়।

8. ক্ষুধার যন্ত্রণা:

দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী অভিভবকগণ তার শিশুকে নিয়মিত খাবার দিতে পারে না। ফলে তারা পুষ্টিহীন হয়ে পড়ে। এই পুষ্টিহীন শিশুরা পড়াশুনায় যেমন অপারগ তেমনি ধারাবিহিক মুল্যায়নের সকল কাজে দূর্বল।

9. নৈতিক শিক্ষার অভাব:

সমাজের নৈতিক শিক্ষা জিরো টলারেন্সে আছে। তারা মনে করেন নৈতিকতা দিয়ে ভাত জুটবে না। তাছাড়া আমরা দেখি নীতিনৈতিকতাহীন মানুষ গুলো এখন সমাজে নেতৃত্ব কবজা করে রেখেছে। এই অমানুষ গুলোর প্রভাবে নীতিনৈতিকতার মানুষ গুলোর ইজ্জৎ ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে হরদম। তাই নীতির প্রতি আর নৈতিকতার উপর মানুষের নির্ভরতা আর নেই।

এছাড়াও আরো কিছু বিশেষ সমস্যা হয়েছে যেগুলির কথা উল্লেখ না করলেই নয়। সেগুলি হলো --

1. **অবকাঠামোগত সমস্যা:** অনেক স্কুলে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, আসন, বাথরুম নেই। অনেক স্কুলে বিদ্যুৎ, পানি, এবং স্যানিটেশনের সুবিধা নেই। এই সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

2. **শিক্ষক সংকট:** অনেক স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, এবং অনেক শিক্ষক অপ্রশিক্ষিত। শিক্ষকদের বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা কম, যার কারণে তারা অন্য কাজে চলে যান। এই সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান কমে যায়।

3. **শিক্ষার মান:** শিক্ষার মান নিম্ন, এবং শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে পড়তে ও লিখতে পারে না। শিক্ষার পদ্ধতি পুরানো এবং অপ্রাসঙ্গিক। এই সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে ভালো করতে পারে না।

4. **উপস্থিতির হার:** শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কম, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। অনেক শিক্ষার্থী স্কুলে আসে না, কারণ তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ। এই সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

5. **অভিভাবকের সচেতনতার অভাব:** অনেক অভিভাবক শিক্ষার গুরুত্ব বোঝেন না, এবং তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠান না। অভিভাবকদের শিক্ষার স্তর কম, যার কারণে তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ে সঠিকভাবে সাহায্য করতে পারেন না।

6. **ড্রপআউট:** অনেক শিক্ষার্থী স্কুল ছেড়ে দেয়, বিশেষ করে মেয়েরা। এর কারণ হল পরিবারের আর্থিক অবস্থা, বাল্যবিবাহ, এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

7. **প্রযুক্তির অভাব:** অনেক স্কুলে প্রযুক্তির সুবিধা নেই, যেমন কম্পিউটার, ইন্টারনেট। শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তির ব্যবহার শিখতে পারে না, যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন।

8. **শিক্ষা ব্যবস্থার জটিলতা:** শিক্ষা ব্যবস্থা জটিল, এবং অনেক সময় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না। শিক্ষার পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

9. **সামাজিক সমস্যা:** সামাজিক সমস্যা যেমন বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, এবং অন্যান্য সমস্যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

10. **অর্থের অভাব:** শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ নেই, যার কারণে স্কুলের অবকাঠামো, শিক্ষকদের বেতন, এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা যায় না।

11. **শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব:** অনেক শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন, যার কারণে তারা শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারেন না। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, যার কারণে তারা তাদের শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে পারেন না।

12. **শিক্ষার বিষয়বস্তুর অভাব:** শিক্ষার বিষয়বস্তু অপ্রাসঙ্গিক এবং পুরানো, যার কারণে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীরা বর্তমান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

13. **শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের অভাব:** শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয় না, যার কারণে তারা তাদের দক্ষতা এবং জ্ঞান বিকাশ করতে পারে না। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন, যাতে তারা তাদের শক্তি এবং দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারে।

14. **শিক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতার অভাব:** শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নেই, যার কারণে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষার বিষয়ে সঠিক তথ্য পায় না। শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা প্রয়োজন, যাতে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষার বিষয়ে সঠিক তথ্য পেতে পারে।

15. **শিক্ষার অধিকারের অভাব:** অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত, বিশেষ করে দরিদ্র এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার অধিকার সকল শিক্ষার্থীর জন্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

যদিও ভারত গত ১০ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয়ের মান উন্নত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে, তবুও শিক্ষার ফলাফল এখনও অত্যন্ত কম।

শিক্ষায় বিনিয়োগ সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে এবং উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান এবং মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিকদের প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে, এবং তাই ভারত সরকারের 'অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি' এজেন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গত দশকে সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA) এর অধীনে শিক্ষা বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেছে এবং এই অতিরিক্ত ব্যয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার, অবকাঠামো, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, শিক্ষক বেতন এবং ছাত্র তালিকাভুক্তির উন্নতিতে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। তবুও, শিক্ষার্থীদের শেখার স্তর এবং গতিপথ উদ্বেগজনকভাবে কম, জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক গবেষণায় দেখা গেছে যে 6-14 বছর বয়সী 60% এরও বেশি শিশু দ্বিতীয় শ্রেণীর স্তরে পড়তে অক্ষম। অধিকন্তু, সময়ের সাথে সাথে শেখার ফলাফলের উন্নতির কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি (এবং এমনকি অবনতিও হতে পারে)। সুতরাং, ব্যয়কে ফলাফলে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বল কর্মক্ষমতা অর্থনীতিতে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা উভয়কেই হুমকির মুখে ফেলে এবং নাগরিকদের আধুনিকীকরণকারী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে।

গত দশকে উন্নত শিক্ষার ফলাফলের কারণ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছু উচ্চমানের অভিজ্ঞতামূলক গবেষণাও দেখা গেছে, যা তথ্যের বৃহৎ নমুনা এবং কার্যকারণ সম্পর্ক সনাক্তকরণের প্রতি যত্নশীল মনোযোগের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এই গবেষণায় উন্নত শিক্ষার ফলাফলে অর্থপূর্ণ অবদান রাখে না এমন হস্তক্ষেপ এবং অত্যন্ত কার্যকর হস্তক্ষেপ উভয় বিষয়েই জোরালো ফলাফল পাওয়া গেছে। বিশেষ করে, গত দশকের গবেষণা থেকে জানা গেছে যে প্রাথমিক শিক্ষায় 'স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা' পদ্ধতিতে ইনপুট বৃদ্ধি করলে শিক্ষার্থীদের শেখার অর্থপূর্ণ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা কম, যদি না শিক্ষাব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এবং/অথবা স্কুল পরিচালনার উন্নতি না হয়। অতএব, শিক্ষানীতির গুরুত্ব কেবল 'স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা' পদ্ধতিতে আরও স্কুল ইনপুট প্রদানের পরিবর্তে শিক্ষার ফলাফল উন্নত করার উপর জোর দেওয়া অপরিহার্য।

গত দশকে শিক্ষা ব্যয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি হল স্কুলের সুযোগ-সুবিধা এবং অবকাঠামো উন্নত করা, শিক্ষকদের বেতন এবং প্রশিক্ষণ উন্নত করা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কমাতে আরও শিক্ষক নিয়োগ করা এবং পাঠ্যপুস্তক এবং মিড-ডে মিলের মতো শিক্ষার্থীর সুবিধাগুলিতে ব্যয় করা। প্রশাসনিক এবং জরিপ উভয় তথ্য বিশ্লেষণে স্কুল শিক্ষার মানের বেশিরভাগ ইনপুট-ভিত্তিক পরিমাপে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেছে। কিন্তু গত দশকের গবেষণায় স্কুলের সুযোগ-সুবিধাগুলিতে এই উন্নতির প্রভাব শেখার ফলাফলের উপর খুব কমই দেখা গেছে। এর অর্থ এই নয় যে স্কুলের সুযোগ-সুবিধা এবং অবকাঠামো শেখার ফলাফল

উন্নত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় (এগুলি প্রয়োজনীয় হতে পারে তবে পর্যাপ্ত নয়), তবে ফলাফলগুলি তুলে ধরে যে শিক্ষার স্তর এবং গতিপথ উন্নত করার উপর অবকাঠামো নিজেই উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে না। একইভাবে, মিড-ডে মিল প্রোগ্রামগুলির (পুষ্টি এবং শিশু কল্যাণ সহ) ভাল সামাজিক কারণ থাকতে পারে, তবে এমন কোনও প্রমাণ নেই যে তারা শেখার ফলাফল উন্নত করে।

আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হল, ভারতে শিক্ষা সংক্রান্ত কোনও বিশ্বাসযোগ্য গবেষণায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের এবং শিক্ষার্থীদের শেখার উন্নতিতে তাদের কার্যকারিতার মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। একইভাবে, শিক্ষকদের বেতন এবং শিক্ষার্থীদের শেখার উন্নতিতে তাদের কার্যকারিতার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই, এবং সর্বোত্তমভাবে শেখার ফলাফলের উপর ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হ্রাসের খুব সামান্য ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। নীচে আরও আলোচনা করা হয়েছে, এই অত্যন্ত স্পষ্ট ফলাফলগুলি সম্ভবত শিক্ষাদান এবং শাসনব্যবস্থার দুর্বলতাগুলিকে প্রতিফলিত করে যা বর্ধিত ব্যয়কে আরও ভাল ফলাফলে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে মূল বাধা।

এখন পর্যন্ত সংক্ষেপিত ফলাফলগুলি বেশ হতাশাজনক হতে পারে, এবং সম্ভবত এটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে 'শিক্ষার ফলাফল উন্নত করা - বিশেষ করে এমন একটি বিতরণে যেখানে লক্ষ লক্ষ প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী রয়েছে - খুবই কঠিন, এবং তাই আমরা যা করতে পারি তা হল কার্যকরী স্কুলগুলির সাথে সম্পর্কিত মানসম্মত ইনপুট সরবরাহ করা এবং দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাবের আশা করা।' সৌভাগ্যবশত, খবরটি সব খারাপ নয়, কারণ গত দশকের প্রমাণগুলি ধারাবাহিকভাবে এমন হস্তক্ষেপের দিকেও ইঙ্গিত করে যা শেখার ফলাফল উন্নত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে এবং ব্যয়ের স্থিতাবস্থার ধরণগুলির তুলনায় অনেক বেশি ব্যয়-কার্যকর উপায়ে তা করতে সক্ষম।

সময়টা পাল্টেছে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এখন গুণগত মানকেও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বাস্তবিকভাবেই গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। জাতীয় উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও গতিশীল সমাজ গঠনে গুণগত শিক্ষা চালকের ভূমিকা নিতে পারে। গুণগত ধারার এ শিক্ষার শুরু হতে হবে প্রাথমিক অবস্থা থেকেই। শিশুদের কচি মনে প্রকৃত শিক্ষার বীজটা বপন করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায়। সন্দেহ নেই, প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সব শিক্ষার মূল ভিত্তি।

সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের জীবনধারা। একটা সময় ছিল, বাবা-মায়ের কাছে শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ শেষে বিদ্যালয়ে পাঠানো হতো শিশুদের। এখন বাবার সঙ্গে মায়েরও ব্যস্ততা বেড়েছে। চাকরি, সামাজিক দায়িত্ব, সংসার গোছানোসহ নানা কিছুতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন আমাদের মায়েরা। ইচ্ছে থাকা সত্তে¡ও অনেক মা তাদের সন্তানকে প্রাথমিক পাঠটুকুও দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। এসব ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভ,মিকা রাখছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রও চালু করেছে।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। দেশের সার্বিক অবস্থার বিবেচনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় অনেকেই আগ্রহী নন। তবে এ আগ্রহের ধরনে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের বেতন-কাঠামো আকর্ষণীয় ও সন্তোষজনক করা, নিয়োগ-প্রক্রিয়া সুষ্ঠু করা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের বর্তমান ধারার সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরি। আশার কথা হলো, সরকার এ ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

শিক্ষকদের চরিত্রগুণ এবং জ্ঞানের গভীরতায় শিশুরা প্রভাবিত হয়। একজন আদর্শ শিক্ষক শুধু পাঠ্যবই ই নয় জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রতি শিশুদের আগ্রহী করে তোলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুর মানসিক গঠনে ভূমিকা রাখেন। তাই বিশ্ব গ্রামের নাগরিক হিসেবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই শিশুদের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্প সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে।শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে গুণগত শিক্ষা বা মানসম্মত শিক্ষাকে।

২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১০ বছর সময়কে 'জাতিসংঘ শিক্ষা দশক' হিসাবে গণ্য করে ইউনেস্কো গুণগত শিক্ষার কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছিল। গুণগত শিক্ষা এমন একটি বিষয় যা কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না।

এজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন উপাদান যেমন যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, সঠিক ভৌত অবকাঠামো, উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি, উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতির সমন্বিত এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা। গুণগত শিক্ষার জন্য যে উপাদানটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। তাই মেধাবী শিক্ষকদের জন্য বুনিয়াদি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। লব্ধ প্রশিক্ষণ কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে সেটিও নিবিড়ভাবে লক্ষ করা প্রয়োজন। বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করে উত্তরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যুক্তিসংগত অনুপাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই গুণগত বা কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতে অন্তরায়গুলো হচ্ছে প্রাথমিকে ঝরে পড়ার উচ্চহার, অতিদরিদ্র বা দুর্গম এলাকার শিশুদের ভর্তি না-হওয়ার প্রবণতা, বাল্যবিবাহ ও অন্যান্য কারণে নারী শিক্ষার্থী হ্রাস, শহরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান দরিদ্র জনসংখ্যা এবং মানসম্মত প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশের অভাব। মেধাবী শিক্ষকদের কমিটমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান অনেক বেশি বেড়ে যাবে। তবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান আরো বাড়ানো উচিত। চলমান পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে যে ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে, তার আরো আধুনিকায়ন করা অত্যাবশ্যক। এই অত্যাবশ্যকের প্রেক্ষাপট আগেই বলেছি। প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকদের শুধু তাত্তি¡কভাবে পড়ানোর প্রশিক্ষণ কাজে আসে না। এভাবে পড়াতে হবে কিংবা ওভাবে, এসব না বলে হাতে-কলমে শিখিয়ে দিতে হবে। এর জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্প্রতি ইউনেস্কোর এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল ব্যুরো ফর এডুকেশন বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবেই শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলির জন্য প্রয়োজন:

(ক) স্কুল সুযোগ-সুবিধার সার্বজনীন ব্যবস্থা,

(খ) শিক্ষার্থীদের সর্বজনীন তালিকাভুক্তি।

(গ) শিক্ষার্থীদের সার্বজনীন ধারণক্ষমতা

(ঘ) শিক্ষার গুণগত উন্নতি।

(ক) স্কুল সুযোগ-সুবিধার সার্বজনীন ব্যবস্থা:

স্কুলের সুযোগ-সুবিধার সার্বজনীন ব্যবস্থার অর্থ হল দেশের ৬-১৪ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য স্কুলের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিত এবং স্কুলটি শিশুদের বাড়ি থেকে হাঁটার দূরত্বের মধ্যে হওয়া উচিত। এই সুবিধা প্রদানের জন্য সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। আমরা এই দিকে যথেষ্ট পরিমাণে সফল হয়েছি।

(খ) শিক্ষার্থীদের সর্বজনীন ভর্তি:

স্কুলের সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি আসে ভর্তির সার্বজনীনীকরণ, যার অর্থ ৬-১৪ বছর বয়সী সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, রাজ্যগুলি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন কার্যকর করেছে। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার জন্য এটি একটি দুঃখজনক মন্তব্য যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি। গ্রামীণ এলাকায় সার্বজনীন ভর্তির সমস্যা আরও জটিল।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অগ্রগতির গতিকে পিছিয়ে দেয়:

(i) পিতামাতার অজ্ঞতা এবং নিরক্ষরতা।

(ii) স্কুল এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার অভাব।

(iii) কাঙ্ক্ষিত তালিকাভুক্তির প্রতি কর্তৃপক্ষের উদাসীন মনোভাব।

(iv) আর্থিক অসুবিধা।

(গ) ভর্তিকৃত শিশুদের সার্বজনীন ধরে রাখা:

সার্বজনীন ধারণের অর্থ হল স্কুলে যোগদানের পর, শিশুটি তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোর্স শেষ না করা পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। যদি শিশুটি তার কোর্স শেষ না করেই প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করে, তাহলে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনীকরণের আদর্শ পরাজিত হবে।

এনসিইআরটি কর্তৃক প্রদত্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলি নিম্নরূপ:

(i) স্কুলের সময়সূচীর সমন্বয়

(ii) স্কুল বৃত্তির সমন্বয়।

(iii) শিক্ষার প্রতি পিতামাতার উদাসীনতা।

(iv) বিদ্যালয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি, আকর্ষণ এবং ধরে রাখা।

(ঘ) শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন:

বাধ্যতামূলক শিক্ষার সার্বজনীনীকরণ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়নি। এটি একটি উন্মুক্ত গোপন বিষয় যে মান বা মানকে অবহেলা করা হয়েছে। এখন পরিমাণের সাথে মান নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। আমরা সম্প্রসারণের গতি কমিয়ে দিতে পারি না। আমাদের প্রতিটি শিশুর জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

গুণগত উন্নয়নের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিম্নরূপ:

(i) শিক্ষকদের সমস্যা।

(ii) আনুষঙ্গিক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা।

(iii) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীবিভাগের সমস্যা।

(iv) পাঠ্যক্রমের সমস্যা।

(v) স্কুল ভবনের সমস্যা।

(vi) স্কুলের সুযোগ-সুবিধার সমস্যা।

(vii) প্রশাসনের সমস্যা।

(viii) অর্থের সমস্যা।

আমরা যদি সত্যিই প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত করতে আগ্রহী হই, তাহলে আমাদের শিক্ষকদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষকদের অবস্থা উন্নত করার জন্য নিম্নলিখিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত:

(i) শিক্ষকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করে এই পেশায় আরও ভালো ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করতে হবে। জাতীয় শিক্ষা নীতি, ১৯৮৬-এও পর্যালোচনাটি অনুমোদন করা হয়েছে এই বলে যে, "শিক্ষকদের বেতন এবং চাকরির অবস্থা তাদের সামাজিক ও পেশাগত দায়িত্বের সাথে এবং পেশায় প্রতিভা আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।"

(ii) শিক্ষাকে সর্বজনীন করার জন্য রাষ্ট্রকে স্কুল স্বাস্থ্য, মধ্যাহ্নভোজ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, লেখার উপকরণ, স্কুল ইউনিফর্ম ইত্যাদির মতো আনুষঙ্গিক পরিষেবা প্রদানের জন্য সম্পদ খুঁজে বের করতে হবে। সম্প্রতি, ১৯৯৫ সালে, বর্তমান সরকারগুলি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য মধ্যাহ্নভোজ সরবরাহের ব্যবস্থা চালু করেছে। আসুন আমরা আশা করি যে এই কর্মসূচি থেকে সর্বোত্তম ফলাফল আসবে।

(iii) সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পাঁচ-পয়েন্ট স্কেলে - A, B, C, D এবং E - ভিত্তিতে মানদণ্ডের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত। আশা করা যায় যে এই ধারণাটি যদি আন্তরিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এটি মান বৃদ্ধিতে বস্তুগতভাবে সাহায্য করবে।

(iv) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সুপরিকল্পিত প্রকল্পের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

(v) সরকারের উচিত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত ভবন সরবরাহ করা। এই উদ্দেশ্যে, গ্রামীণ সম্প্রদায়কে আসবাবপত্র, চক এবং ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদির মতো সকল স্কুল সুবিধা প্রদানের জন্য রাজি করানো উচিত। NPE, 1986 অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় স্কুল সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এটিকে "অপারেশন ব্ল্যাক বোর্ড" নামে অভিহিত করেছে।

(vi) প্রতিটি গ্রামে একটি গ্রাম স্কুল কমিটি থাকা উচিত। এই কমিটি ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, খেলার মাঠ এবং স্কুল বাগান, আনুষঙ্গিক পরিষেবার ব্যবস্থা, সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদি দেখাশোনা করবে। দায়িত্ব পালনের জন্য, কমিটির কাছে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুদান এবং অনুদানের মাধ্যমে পর্যাপ্ত তহবিল থাকবে। আধুনিক বিশ্বে, শিক্ষাকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, এই লক্ষ্যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের মতো শিক্ষাগত উন্নয়নের অনেক কর্মসূচি চলছে।

আধুনিকীকরণ হল ঐতিহ্যবাহী এবং আধা-ঐতিহ্যবাহী ক্রম থেকে নির্দিষ্ট ধরণের প্রযুক্তিতে পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। এটি মূল্যবোধ, সামাজিক কাঠামো এবং ব্যক্তির অর্জনের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি একটি সামগ্রিক, এটি সামগ্রিকভাবে মানুষের চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে।

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা এবং আধুনিকীকরণ :

সাধারণ মানুষের কাছে শিল্পায়ন এবং অটোমেশন আধুনিকীকরণের প্রতীক। যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে উন্নত আরাম এবং উন্নত জীবনযাত্রার মান দেখেন এবং অন্যদিকে, বিজ্ঞান কুসংস্কারকে সরিয়ে দেয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও আধুনিকীকরণের অর্থ অনেক কিছু। একজন শিক্ষাবিদ আধুনিকীকরণের অর্থ শিক্ষার প্রসার, শিক্ষিত ও দক্ষ নাগরিক তৈরি এবং পর্যাপ্ত ও যোগ্য বুদ্ধিজীবীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। অন্যজনের কাছে এর অর্থ শিক্ষাদান-শিক্ষাকে কার্যকর করার জন্য আরও শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ। শিক্ষায় আধুনিকীকরণের একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি কেবল শিক্ষার লক্ষ্য এবং প্রক্রিয়াগুলির জন্যই নয় বরং এর সমগ্র প্রোগ্রামারদের জাতীয় উন্নয়ন, জাতীয় চাহিদা এবং জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পর্কিত করার জন্য একটি নতুন পদ্ধতির অর্থ হবে।

সমসাময়িক শিক্ষা, যা বিভিন্ন রূপে আধুনিকীকরণের বাহক, তাও পাশ্চাত্য উৎসের। ঐতিহ্যগতভাবে, শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল গুপ্ত এবং আধিভৌতিক; এর যোগাযোগ উচ্চবিত্ত বা 'দ্বিগুণ জন্মগ্রহণকারী' বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এর পেশাদার সংগঠনের কাঠামো ছিল বংশগত এবং বন্ধ।

শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে সুপারিশ:

১। শিক্ষা পদ্ধতিকে আনন্দদায়ক করে তোলার মাধ্যমে পাঠ্য বই এর প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তোলা যেতে পারে।

২। প্রাক-প্রাথমিককে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য শিক্ষা উপকরণকে আরোও সুলভ করা যেতে পারে।

৩। শিশু বান্ধব শ্রেণিকক্ষ ও পাঠ্য পুস্তক এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৪। শিক্ষকদের শিশুবান্ধব পাঠদানে উপযোগী, আন্তরিক ও দক্ষ শিক্ষক প্রস্তুতের লক্ষ্যে।

৫। শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে সমাজে শিক্ষকদের মর্যাদার উন্নয়ন সাধন করা যেতে পারে।

৬। শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জবাবদিহীতা আরোও বেশি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

ভারতে শিক্ষার ক্রমাগত আধুনিকীকরণের সাথে সাথে, স্কুলগুলি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি থেকে প্রযুক্তি-সক্ষম, ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে সরে যাচ্ছে। শিক্ষার ভবিষ্যৎ দেখতে পাবে:

হাইব্রিড লার্নিং মডেল - নমনীয়তার জন্য ডিজিটাল এবং শ্রেণীকক্ষ-ভিত্তিক শিক্ষার মিশ্রণ।

এআই-ভিত্তিক শিক্ষার্থী সহায়তা - শিক্ষার্থীদের নিজস্ব গতিতে শিখতে সাহায্য করার জন্য এআই-চালিত সহায়তা ব্যবস্থা।

দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষা - ব্যবহারিক জ্ঞান এবং বাস্তব-বিশ্বের প্রয়োগের উপর জোর।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে শক্তিশালী সহযোগিতা - ইন্টারেক্টিভ শিক্ষার মাধ্যমে বর্ধিত সম্পৃক্ততা।

শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) কর্তৃক প্রস্তাবিত শিক্ষা পুনর্গঠনের কর্মসূচির উপর আধুনিকীকরণের প্রভাব সম্পর্কিত সুপারিশগুলি নিম্নরূপ।

জ্ঞানের বিস্ফোরণ: গত কয়েক বছরে জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটেছে। ঐতিহ্যবাহী সমাজে জ্ঞানের পরিমাণ সীমিত ছিল এবং শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল বিদ্যমান সংস্কৃতির সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রচার। কিন্তু বর্তমান সমাজে জ্ঞানের পরিমাণ অনেক বিস্তৃত। আগে জ্ঞান নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা হত কিন্তু এখন তা সক্রিয়ভাবে আবিষ্কৃত হয়। ঐতিহ্যবাহী সমাজ 'জানতে' বিশ্বাস করত কিন্তু এখন সমাজ 'মন দিয়ে জানাতে' বিশ্বাস করে, যা সৃজনশীল এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার দিকে পরিচালিত করে। শিক্ষা কমিশন বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার নতুন ধারণায় উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকদের একঘেয়েমি ছাড়াই সু-প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়।

দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন: আমাদের গত ব্লগে আমরা এই দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের কারণে শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে আরও এক ধাপ এগিয়ে থাকা উচিত। শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গতিশীল নীতির প্রয়োজন। শিক্ষা কমিশন আরও বিশ্বাস করে যে, ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাদান পদ্ধতির বিপরীতে, শিক্ষাদানের মাধ্যমে মনের জাগরণ, কৌতূহল, আগ্রহ, মনোভাব, মূল্যবোধের বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তোলা উচিত। উদাহরণস্বরূপ: ভালো/মন্দ এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং উন্নত বিচারের মধ্যে পার্থক্য করা।

দ্রুত অগ্রগতির প্রয়োজন: আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলে আমরা ঐতিহ্যবাহী সমাজে ফিরে যেতে পারি না। অতএব, এই আধুনিকীকরণকে শীর্ষে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দ্রুত অগ্রগতির প্রয়োজন। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিকের মতো সমস্যা, বিষয়গুলি অবশ্যই আসবে। কিন্তু আমাদের এগুলো কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে।

আধুনিকীকরণ এবং শিক্ষাগত অগ্রগতি: আধুনিকীকরণ এবং শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষা কমিশনও মনে করে যে আধুনিকীকরণের অগ্রগতি শিক্ষার সমানুপাতিক। আধুনিকীকরণ হল পরিবর্তন আনার একটি প্রক্রিয়া। আধুনিকীকরণের অর্থ অগত্যা নিজস্ব ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তন বা বিচ্ছিন্নতা নয়।

আধুনিকীকরণের জন্য অতীতের ভিত্তির উপর ভিত্তি করে প্রচেষ্টা চালানো উচিত, যা বর্তমানের চাহিদা এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণ নীতি, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এবং আত্ম-শৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। শিক্ষা কমিশন আরও বিশ্বাস করে যে আধুনিকীকরণ ব্যক্তিকে একটি বৃহত্তর জীবনযাত্রা এবং বিভিন্ন ধরণের পছন্দ প্রদানের দিকে পরিচালিত করবে। নিঃসন্দেহে পছন্দের স্বাধীনতার কিছু সুবিধা রয়েছে, তবে এটি মূল্যবোধ ব্যবস্থা এবং প্রেরণার উপরও নির্ভর করে। ব্যক্তির জ্ঞান এবং ক্ষমতা প্রসারিত হয় এবং ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং নৈতিক মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর উপলব্ধি করার ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে। মানবিক মূল্যবোধের বিনিময়ে

আধুনিকীকরণকে পাগলামি করা উচিত নয়। অতএব, শিক্ষার সকল পর্যায়ে মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত। শিশুদের আধুনিকীকরণের সময় জীবনের আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত মূল্যবোধের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে শেখা উচিত।

ভারত যখন AI একীকরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন এই প্রযুক্তিগুলিকে দায়িত্বের সাথে গ্রহণ করা অপরিহার্য, যাতে তারা শিক্ষার মানবিক উপাদানগুলির পরিপূরক এবং বর্ধিত হয়। এর মাধ্যমে, ভারত AI কে আরও গতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করতে ব্যবহার করতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত জাতির বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে এবং 21 শতকে শিক্ষার আলোকবর্তিকা হিসেবে তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে। একবিংশ শতাব্দী দ্রুত প্রযুক্তিগত অগ্রগতির দ্বারা চিহ্নিত, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিক, যার মধ্যে শিক্ষাও রয়েছে, পুনর্গঠনকারী একটি রূপান্তরকারী শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং বৈষম্য সহ ভারতের সমস্যাগুলির জন্য শিক্ষা সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। নালন্দা এবং তক্ষশীলার মতো প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে, জ্ঞান এবং শিক্ষার আলোকবর্তিকা হিসাবে ভারতের উত্তরাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে, ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন অনেক সমস্যায় জর্জরিত যা দেশকে প্রকৃত অগ্রগতি অর্জন থেকে বিরত রাখছে। ভারতের জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা উপলব্ধি করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার একটি পূর্বশর্ত। এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এতে একটি রূপান্তরকারী ভূমিকা পালন করতে পারে। এই নিবন্ধটি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে একীভূত করার সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলি তুলে ধরার একটি প্রচেষ্টা এবং এটিকে পুনর্গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে রূপান্তরকারী ভূমিকা পালন করতে পারে তা স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করে।

ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে AI গ্রহণ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির গুরুত্বের উপর জোর দেয় এবং শেখার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য AI ব্যবহারের প্রচার করে। এই নীতি শিক্ষাগত ফলাফল উন্নত করার জন্য শিক্ষাদান, শেখা এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় AI এর একীকরণের পক্ষে। সরকার AI-চালিত প্রকল্পগুলি পাইলট করার জন্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে অংশীদারিত্ব করার এবং স্কুলগুলিতে ডিজিটাল সংস্থান সরবরাহ করার চেষ্টা করছে। "ডিজিটাল ইন্ডিয়া" প্রচারণার মতো উদ্যোগগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে AI গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করতে সহায়তা করছে। নতুন শিক্ষাগত পটভূমি পরিচালনা করার জন্য শিক্ষকদের AI এবং ডিজিটাল সরঞ্জামগুলিতে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। SWAYAM এবং DIKSHA-এর মতো প্রোগ্রামগুলি শিক্ষকদের ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনলাইন কোর্স এবং সংস্থান সরবরাহ করে। তবে, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে AI কে নির্বিঘ্নে সংহত করার জন্য এখনও অনেক কিছু করা বাকি।

AI দ্বারা পরিচালিত সবচেয়ে রূপান্তরকারী ভূমিকা হবে ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষার সূচনা। শ্রেণীকক্ষে বর্তমান এক-আকার-সকলের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি, যা স্পষ্টতই একজাতীয় নয়, সমস্ত শিক্ষার্থীকে সমানভাবে উপকৃত করছে না। এর সাথে, শিক্ষকদের সাধারণত তাদের শ্রেণীকক্ষে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ডিফারেনশিয়াল লার্নিং স্তর এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য থাকে না। এই প্রেক্ষাপটে AI-কে একীভূত করা রূপান্তরকারী হতে পারে। যদিও AI সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকদের প্রতিস্থাপন করতে পারে না, এটি শিক্ষকদের দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে বহু-স্তরীয়/বহু-স্তরের শ্রেণীকক্ষ পরিচালনায় ব্যাপকভাবে সহায়তা করার সম্ভাবনা রাখে, পৃথক শিক্ষার্থীদের শেখার স্তর বিচার করে এবং প্রতিটি শিশুর শ্রেণী এবং শেখার স্তরের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া কাস্টমাইজড শিক্ষাগত বিষয়বস্তুর স্বয়ংক্রিয় বিকাশের অনুমতি দেয়। এটি ভিন্নভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে, যার ফলে ন্যায়বিচার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে।

উপরন্তু, AI শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রদান করতে পারে, তাদের শেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করতে পারে যা তাদের দুর্বলতাগুলি সনাক্ত করতে এবং উন্নতির দিকে কাজ করতে সহায়তা করতে পারে। এটি শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির আরও ভালভাবে ট্র্যাক রাখতে সক্ষম করে। তৃতীয়ত, AI ব্যবহার করে পরীক্ষার ফলাফল এবং উপস্থিতি রেকর্ড বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের কার্যকলাপ পূর্বাভাস দেওয়া এবং পূর্ব-উদ্দীপক পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি, AI প্রশাসনিক দক্ষতাও উন্নত করে। AI প্রযুক্তিগুলি ভর্তির মতো দিকগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং বিতরণকে রূপান্তরিত করছে। সময়সূচী, গ্রেডিং এবং রেকর্ড রাখার মতো প্রশাসনিক কাজের স্বয়ংক্রিয়করণ শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়া এবং শেখার সুবিধার্থে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার জন্য সময় মুক্ত করে। তদুপরি, AI সরঞ্জামগুলি শিক্ষকদের পরিকল্পনা, বিতরণ, কোর্স মূল্যায়ন এবং প্রশাসনিক কাজ করার তুলনায়

তাদের কাজের চাপ কমাতে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রাখে। এর অর্থ হল শিক্ষার্থীদের উপর মনোযোগ দেওয়ার জন্য আরও বেশি সময় রয়েছে। এটি বিশেষভাবে মূল্যবান কারণ ভারত শিক্ষকের তীব্র ঘাটতির মুখোমুখি। 2017 সালের হিসাবে, ভারতের প্রতি শিক্ষক 32.75 শিক্ষার্থীর অনুপাত বিশ্ব গড়ে 21.75 শিক্ষার্থীর চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

তবে, শিক্ষা ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নির্বিঘ্নে একীভূত করা সহজ হবে না, বিশেষ করে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিস্তৃত কাঠামোগত, প্রযুক্তিগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে। প্রথমত, ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে তীব্র অবকাঠামোগত ঘাটতি রয়েছে। শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাদানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে একীভূত করার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর প্রয়োজন যা সবসময় পাওয়া নাও যেতে পারে। UDISE রিপোর্ট ২০২১-২২ অনুসারে, ভারতের মাত্র ২৫.৯% স্কুলে কার্যকরী ডেস্কটপ/পিসি উপলব্ধ রয়েছে, যেখানে সরকারি স্কুলগুলির মধ্যে এটি মাত্র ১৬.৫%। প্রযুক্তিগত দিক থেকে, বিগ ডেটার অপ্রাপ্যতা একটি সমস্যা।

বর্তমানে, দেশজুড়ে স্কুলগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং বেশিরভাগ স্কুলের ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত বা একেবারেই নেই। অতএব, অ্যালগরিদম তৈরি এবং পরিমার্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় বৃহৎ পরিসরে শিক্ষার্থীদের লেনদেনের তথ্য সংগ্রহ করতে কিছুটা সময় লাগবে। নীতি আয়োগের প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয়েছে যে, AI-এর যেকোনো বাস্তবায়নের আগে পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদানের রেকর্ড এবং শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতা ডিজিটালাইজ করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সামাজিক সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে, AI-চালিত শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমাজ এবং অভিভাবকদের একটি বাধা রয়েছে। ডেটা সিকিউরিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (DSCI) দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে 87% ভারতীয় অভিভাবক অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্মে তাদের সন্তানদের ডেটার গোপনীয়তা এবং সুরক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

পরিশেষে, ভারত যদি তার বিশাল ডিজিটাল বৈষম্য দূর করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে AI-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন নিয়ে সকল বিতর্কই নিরর্থক হবে। অক্সফামের "ভারতীয় বৈষম্য প্রতিবেদন ২০২২: ডিজিটাল বিভাজন" পরামর্শ দেয় যে প্রায় ৭০ শতাংশ ভারতীয়ের ইন্টারনেট সংযোগ দুর্বল বা কোনও ইন্টারনেট সংযোগ নেই এবং ডিজিটাল পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস নেই। ভারতে ডিজিটাল সাক্ষরতাও কম - এমনকি যাদের অ্যাক্সেস আছে তাদের মধ্যেও, প্রায় ৬০ শতাংশ গ্রামীণ জনসংখ্যা এখনও সক্রিয়ভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে না। ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস এবং ব্যবহার আয়, ভূগোল, বর্ণ এবং লিঙ্গ পরামিতি অনুসারে আরও বিভক্ত। ডিজিটাল ইন্ডিয়া, ভারতনেট, জাতীয় ডিজিটাল সাক্ষরতা মিশন এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযানের মতো সরকারি প্রকল্পগুলি পিছিয়ে রয়েছে। AI-এর ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবহারের প্রচারের জন্য স্থল-স্তরের নীতিগত হস্তক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা ব্যবস্থায় AI-এর এক উল্লেখযোগ্য সংহতকরণ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যেখানে সম্ভাব্য ঝরে পড়ার হার সনাক্ত করতে AI ব্যবহার করা হচ্ছে। অ্যাপ্লিকেশনটি জটিল ডেটা সেট প্রক্রিয়া করে যার মধ্যে শিক্ষার্থীর কর্মক্ষমতা, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক জনসংখ্যা, স্কুলের অবকাঠামো এবং শিক্ষকের দক্ষতা সম্পর্কে বিশদ অন্তর্ভুক্ত থাকে যাতে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধরণ খুঁজে বের করা যায় এবং ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকা শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেওয়া যায়। ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য, প্ল্যাটফর্মটি বিশাখাপত্তনম জেলা থেকে ১৯, ৫০০ সম্ভাব্য ঝরে পড়া শিশুকে চিহ্নিত করেছে। এই ঝরে পড়ার মূল কারণগুলি ছিল অপর্যাপ্ত আসবাবপত্র এবং অপর্যাপ্ত টয়লেট অবকাঠামো। অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে চিহ্নিত অন্যান্য প্রভাবশালী কারণগুলি হল: শেখার ফলাফল (৫৭%), অবকাঠামো (৩১%), পরিবর্তন (৭%), বয়সের অনুপযুক্ততা (৪%) এবং সামাজিক বিভাগ (১%)। এর ফলে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকা শিক্ষার্থীদের ট্র্যাকিং, কাউন্সেলিং এবং সমস্যাগুলি সমাধান করা হয়েছে। বিশ্লেষণের পক্ষ থেকে, সরকার শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদের জন্য পাবলিক স্কুলের সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে সরকারি স্কুলে ভর্তি বৃদ্ধির জন্য অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর পাশাপাশি, কেরালার তিরুবনন্তপুরম জেলার একটি স্কুল ভারতের প্রথম এআই শিক্ষক রোবট, আইআরআইএস চালু করেছে, যা জেনারেটিভ এআই-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শাড়িতে সজ্জিত, আইরিস একটি এআই ভয়েস-নিয়ন্ত্রিত সহকারী হিসেবে কাজ করে, ব্যবহারকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেয়, ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু সরবরাহ করে। এটি ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগতকৃত কন্টেন্ট তৈরি, কুইজ এবং ইন্টারেক্টিভ কার্যকলাপের মাধ্যমে ইন্টারেক্টিভ

শেখার অভিজ্ঞতায় জড়িত করে। এই সমস্ত কিছুই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তিত ভূদৃশ্যকে তুলে ধরে যা ধীরে ধীরে এআই-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে। তবে, একটি বিস্তৃত নীতিগত ব্যাকআপের প্রয়োজন রয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে AI ব্যবহারের যে কোনও নীতি এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে AI ডিজাইনে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা যায়। কেরালায় IT@Schools প্রোগ্রামের অংশগ্রহণমূলক মডেলের সাফল্যের গল্প, যেখানে শিক্ষকরা স্কুলগুলিতে ICT-এর একীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, এটি এর প্রমাণ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে AI সাক্ষরতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ছোটবেলা থেকেই পাঠ্যক্রমের মধ্যে AI ধারণাগুলিকে একীভূত করা এবং শিক্ষার্থীদের AI এবং এর ফলাফলগুলিকে সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করতে শেখানো প্রয়োজন। পরিচালিত অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে ৫০% এরও বেশি শিক্ষার্থী শিক্ষায় AI কীভাবে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানে না। আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে AI-কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল দেশকে জর্জরিত ডিজিটাল বিভাজন থেকে মুক্তি দেওয়া। এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা এবং ন্যায়ের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। আরও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নীতির উপর মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন।

শিক্ষাক্ষেত্রে AI ব্যবহারের জন্য নীতিগত নির্দেশিকা তৈরি করাও প্রয়োজন, যার মধ্যে ন্যায্যতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার উপর জোর দেওয়া উচিত। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমগুলিতে AI নীতিশাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের অধিকার এবং সুরক্ষা রক্ষার জন্য ডেটা গোপনীয়তা এবং AI-এর নৈতিক ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। AI সিস্টেমগুলি দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করা এবং শিক্ষার্থীদের ডেটা অপব্যবহার থেকে সুরক্ষিত রাখা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্বেগগুলি মোকাবেলা করার জন্য স্পষ্ট নির্দেশিকা এবং নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ভারত যখন AI ইন্টিগ্রেশনের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন এই প্রযুক্তিগুলিকে দায়িত্বের সাথে গ্রহণ করা অপরিহার্য, যাতে তারা শিক্ষার মানবিক উপাদানগুলির পরিপূরক এবং বর্ধিত হয়। এর মাধ্যমে, ভারত AI কে আরও গতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত দেশের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে এবং 21 শতকে শিক্ষার আলোকবর্তিকা হিসেবে তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে। চ্যালেঞ্জগুলি বোঝার মাধ্যমে এবং AI দ্বারা উপস্থাপিত সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়ে, অংশীদাররা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরির দিকে কাজ করতে পারে যা শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়িত করে এবং 21 শতকের চাহিদার জন্য তাদের প্রস্তুত করে। অ্যাপলের সিইও টিম কুক যেমন পুনর্ব্যক্ত করেছেন, "প্রযুক্তি মানবতার সাথে মিশে যাওয়া উচিত, প্রযুক্তি দ্বারা মানবতা গ্রাস করা উচিত নয়"

তথ্যসূত্র

1. IDEAS FOR INDIA (কার্তিক মুরলিধরন)
2. শিক্ষা মন্ত্রণালয়। (২০২২)। ২০২১-২২ শিক্ষার জন্য ইউনিফাইড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের প্রতিবেদন
3. নীতি আয়োগ, (২০১৮) জাতীয় কৌশল ফর এআই: এআই ফর অল।
4. নীতি আয়োগ (২০২১)। দায়িত্বশীল এআই #সকলের জন্য এআই: ভারতের জন্য পদ্ধতির নথি।
5. ভারতের বৈষম্য প্রতিবেদন।

   দুবে, গুঞ্জন ও হাসান, মোহাম্মদ ও আলম, আফতাব।

   কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা: প্রতিশ্রুতিশীল প্রয়োগ, সম্ভাব্য কার্যকারিতা এবং চ্যালেঞ্জ।
6. ই-জার্নাল এইচআরডিসি, ভারতীয় শিক্ষার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কার্যকর করা। পরিবর্তনের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি।

   ভিজ, আংশিতা এবং আগরওয়াল, প্রগতি।

7. ভারতীয় শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলি মূল্যায়ন। আন্তর্জাতিক জার্নাল ফর গ্লোবাল একাডেমিক অ্যান্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ।

8. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর ও সংস্কার। ডিজিটাল শিক্ষা পর্যালোচনা, ৯৮-১০৫, https://doi.org/10.1344/der.2024.45.98-105

রায়, সুমন এবং পল, সুজিত।

9. শিক্ষায় বিপ্লব: কীভাবে এআই শেখার ল্যান্ডস্কেপকে রূপান্তরিত করছে। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ট্রেন্ড ইন সায়েন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ৭(৪), ৭৪৮-৭৫৬, আইএসএসএন: ২৪৫৬ – ৬৪৭০।

মজিদ, ইশফাক এবং লক্ষ্মী, বিজয়া।

10. শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। দ্য ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন। ৪৫(৩), ১১-১৬, আইএসএসএন ০৯৭১-৩০৩৪।

যাদব, প্রভাত কুমার।

11. ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব আনতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা: একটি গুঞ্জন বা বাস্তবতা। শিক্ষাগত রূপান্তর, ২(১), ১-৬, আইএসএসএন: ২৫৮৩-৪৭৫৪

Citation: **Ghosh. A.,** (2024) "প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা ও আধুনিকরণের প্রচেষ্টা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-10, November-2024.